১৭ ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণী ও জাতীয় আন্দোলন

আধুনিক শ্রমশিল্পের মন্থর সূচনা এবং রেলপথ ও ডাক-তার বিভাগের মত উপযোগ শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে আধুনিক শ্রমিকের আবির্ভাব ঘটে। দেশের বিভিন্ন অংশে শ্রমিকদের অসম গোষ্ঠীগুলোর একটা সংগঠিত, আত্মসচেতন, সর্বভারতীয় শ্রেণী হিসেবে গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ও ভারতীয় 'জাতি গড়ে ওঠার' প্রক্রিয়ার অগ্রগতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। কেননা ভারতীয় 'জাতি'র ধারণাটি শিকড় গাড়তে শুরু করার আগে ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর ধারণার অস্তিত্বই থাকতে পারে না।

★

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে। কিন্তু তার আগেই বোম্বাই, কলকাতা, আমেদাবাদ, সুরাট, মাদ্রাজ, কোয়েম্বাটোর, ওয়ার্ধা ও আরো অনেক জায়গার বস্ত্রকলে, রেলে ও বাগিচায় শ্রমিকদের ধর্মঘট সমেত নানা আন্দোলন হয়েছে। তবে এগুলো ছিল প্রধানত বিক্ষিপ্ত, স্বতঃস্ফূর্ত ও অসংগঠিত আন্দোলন আশু অর্থনৈতিক দাবিদাওয়াই ছিল এসবের ভিত্তি, এবং এগুলোর ব্যাপক রাজনৈতিক তাৎপর্য কার্যত ছিল না।

শ্রমিকদের জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতির জন্য কিছু সংগঠিত প্রয়াসও আগে নেওয়া হয়েছে। লোকহিতৈষী ব্যক্তিরা ১৮৭০-এর দশকেই এই ধরনের প্রয়াস চালিয়েছিলেন। ১৮৭৮-এ সোরাবজী শাপুরজী বেঙ্গলী শ্রমিকদের কাজের ঘন্টা সীমাবদ্ধ করে দেওয়ার জন্যে বোম্বাই আইনসভায় একটি বিল আনার ব্যর্থ প্রয়াস চালান। বাংলায় শশিপদ ব্যানার্জী নামে একজন ব্রাহ্ম সমাজ সংস্কারক ১৮৭০-এ শ্রমজীবী সঙ্ঘ গঠন করেন। শ্রমিকদের শিক্ষিত করার মূল লক্ষ্য নিয়ে প্রকাশ করেন 'ভারত শ্রমজীবী' নামে একটা মাসিক পত্রিকা। বোম্বাইতে নারায়ণ মেঘাজী লোখাণ্ডে 'দীনবন্ধু' নামে একটা ইঙ্গ-মারাঠী সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন ১৮৮০-তে। আর ১৮৯০-তে স্থাপন করেন বোম্বাই মিল ও মিল-শ্রমিক সমিতি। লোখাণ্ডে শ্রমিকদের নিয়ে অনেকগুলো সভা করেন এবং ৫,৫০০ মিল শ্রমিকের স্বাক্ষর সম্বলিত একটা স্মারকলিপি বোম্বাই কারখানা কমিশনের কাছে পেশ করেন। এতে শ্রমিকদের ন্যূনতম কতগুলো দাবি তোলা হয়েছিল। মানতেই হবে, এসব প্রয়াস চরিত্রের দিক থেকে জনহিতৈষণামূলক এবং তা সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের সূচনা করেনি। তাছাড়া, এই লোকহিতৈষীরা সমসাময়িক জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোতধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।

Scanned with CamScanner

বাস্তবিকপক্ষে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল স্রোতধারা তখনো পর্যন্ত শ্রমিকদের সমস্যা সম্পর্কে ছিল নিস্পৃহ। সেই সময়ে শ্রমিকদের অবস্থা সত্যি সত্যিই খুব শোচনীয় হওয়া সত্ত্বেও আদি জাতীয়তাবাদীরা শুরুতে এদের সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে খুব সামান্যই নজর দিয়েছেন। ইউরোপীয় সংস্থায় কর্মরত শ্রমিকদের ও ভারতীয় সংস্থায় কর্মরত শ্রমিকদের সম্পর্কে তাদের মনোভাব ছিল লক্ষণীয়ভাবে আলাদা। তবে এর কারণ বোঝা যায়।

শ্রমিকদের সম্পর্কে আদি জাতীয়তাবাদীদের তুলনামূলকভাবে নিস্পৃহ মনোভাবের অন্যতম প্রধান কারণ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন যখন একেবারে শৈশবাবস্থায় ছিল সেই সময়ে জাতীয়তাবাদীরা ভারতীয় জনগণের মধ্যে কোন বিভাজন সৃষ্টি করে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অভিন্ন সংগ্রামকে দুর্বল করতে চাননি। ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে এটা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করেছেন। দাদাভাই নৌরজী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনেই (১৮৮৬) স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন কংগ্রেস 'নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবে সেই সব বিষয়ের মধ্যে যেগুলোতে সমগ্র জাতি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে, এবং সমাজ সংস্কার ও অন্যান্য শ্রেণীগত বিষয়গুলো ছেড়ে দেবে শ্রেণীভিত্তিক কংগ্রেসগুলোর উপর।'[১] পরবর্তিকালে, জাতীয় আন্দোলন শক্তিশালী হতে এবং জাতীয়তাবাদী কর্মী বাহিনীতে শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করার অভ্যাসগত বাধা কমতে থাকে। শ্রমিকদের জন্যে সক্রিয় আন্দোলন করার নানা মতাদর্শগত প্রবণতা দেখা দেয়। এবার শ্রমিকদের সংগঠিত করার এবং অভিন্ন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মোর্চায় বেশি শক্তিশালী শ্রেণীগুলোর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে তাদের দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়ানর প্রচেষ্টা শুরু হল। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট বজায় রাখার প্রয়াস তখন চালানো হলেও একতরফাভাবে শ্রমিক ও নিপীড়িতদের স্বার্থের বিনিময়ে ঐক্য রক্ষা করতে চাওয়া হয়নি। বরং ঐক্যসাধন করা হয়েছে শক্তিশালী সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলো সমেত সকল শ্রেণীর আত্মত্যাগ কিংবা স্বার্থত্যাগের মাধ্যমে।

এই পর্যায়ে অবশ্য দেশী মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় এগিয়ে আসার ইচ্ছা জাতীয়তাবাদীদের ছিল না। বাস্তবিকপক্ষে, অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রই কাজের অবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্যে কোন সরকারি আইন প্রণয়নের প্রয়োজন আছে বলে মনে করত না এবং ১৮৮১-র ও ১৮৯১-র 'কারখানা আইন'-এর সক্রিয় বিরোধিতা করেছিল। অনুরূপভাবে, ভারতীয় বস্ত্রকলগুলোতে ধর্মঘটও সাধারণত সমর্থন করা হয়নি। সদ্যোজাত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে কোন বিভাজন সৃষ্টি করতে তারা চাননি। এটা ছাড়াও জাতীয়তাবাদীদের এই মনোভাবের পিছনে অন্যান্য কারণও ছিল। তারা সঠিকভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন সরকার শ্রম আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিচ্ছেন ব্রিটিশ মিল মালিকদের স্বার্থে। ব্রিটিশ পণ্যের সঙ্গে ভারতীয় পণ্যের প্রতিযোগিতা বেড়ে চলেছিল। ভারতে সঙ্কুচিত হচ্ছিল ব্রিটিশ পণ্যের বাজার। তাই তারা ভারতে কারখানা আইন লাগু করার জন্যে প্রভাব খাটাচ্ছিলেন। যেমন, কারখানায় শ্রমিকদের কাজের ঘন্টা কমালে ভারতীয় শ্রমশিল্প প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে তা কমে যাবে। তাছাড়া, আদি জাতীয়তাবাদীরা দ্রুত শিল্পায়নকেই ভারতের দারিদ্র্য ও অধঃপতনের সর্বরোগহর দাবাই বলে মনে করতেন। এই প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করত পারে এমন কোন পদক্ষেপ সমর্থন করতে তারা চাইতেন না। তারা বলতেন, ভারতের শ্রমশিল্প এখন শৈশবাবস্থায় রয়েছে। এখানে শ্রম আইন চালু করলে শ্রমশিল্পের উপর তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে, এবং তা যে হাস সোনার ডিম দেয় তাকে মেরে ফেলার শামিল। আবার 'মারাঠা'র মত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রও ছিল। জি. এস. আগরকরের মত আমূল সংস্কারকামী চিন্তাবিদের প্রভাবে এই পত্রিকাটি সেই পর্যায়েই শ্রমিকদের স্বার্থ সমর্থন করে মিল মালিকদের পরামর্শ দেয় শ্রমিকদের কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্যে। তবে, এই প্রবণতা তখনো ছিল খুবই সীমিত।

Scanned with CamScanner

দৃশ্যপট সম্পূর্ণ বদলে যেত ব্রিটিশ মালিকানাধীন সংস্থাগুলোতে নিযুক্ত ভারতীয় শ্রমিকদের প্রশ্নে। এক্ষেত্রে শ্রমিকদের পূর্ণ সমর্থন জানাতে জাতীয়তাবাদীরা এতটুকু ইতস্তত করেননি। ১৮৯১-তে কংগ্রেসের সভাপতি পি. আনন্দ চারলুর কথায়, অংশত এর কারণ এই মালিক ও শ্রমিকরা 'একই জাতির অপরিহার্য অংশ' ছিল না।[২]

আসামের চা-বাগিচা শ্রমিকদের কার্যত দাসে পরিণত করা হয়েছিল এবং পলায়নরত শ্রমিকদের গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়ার অধিকার আইনের মাধ্যমে ইউরোপীয় বাগিচা মালিকদের দেওয়া হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলো প্রচার শুরু করে দিয়েছিল। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সহায়তায় বিদেশী পুঁজিপতিদের এই লাগামহীন শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্যে জাতীয় সম্মান ও মর্যাদা বোধে নাড়া দেওয়ার চেষ্টা হয়।

তাই শ্রমিক শ্রেণীর কোন অংশের সম্ভবত প্রথম সংগঠিত ধর্মঘট যে ব্রিটিশ মালিকানাধীন ও ব্যবস্থাপনাধীন রেলপথে হয়েছিল তা মোটেই আকস্মিক নয়। ১৮৯৯-র মে মাসে 'গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে'র (জি আই পি) সিগনাল কর্মীরা এই ধর্মঘট করেছিলেন। তারা জানিয়েছিলেন বেতন বাড়ানর, কাজের ঘন্টা নির্দিষ্ট করার ও কাজের শর্তগুলো উন্নত করার দাবি। প্রায় সব জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রই এই ধর্মঘটকে পুরোপুরি সমর্থন করে। তিলকের 'মারাঠা' ও 'কেশরী' মাসের পর মাস ধরে এর পক্ষে প্রচার চালায়। ধর্মঘটের সমর্থনে বোম্বাই ও বাংলাতে জনসভা ও অর্থ সংগ্রহের কাজ সংগঠিত করেন ফিরোজশা মেহতা, ডি. ই. ওয়াচা ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতারা। এসব ক্ষেত্রে শোষক ছিল বিদেশী। এটাই এর বিরুদ্ধে আন্দোলনকে জাতীয় বিষয় করে তোলার এবং একে জাতীয় আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

এই শতাব্দীর শুরুতে শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা নতুন প্রবণতা দেখা দেয়। যেমন বিপিনচন্দ্র পাল এবং জি. সুব্রমনিয়া আয়ার শক্তিশালী পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সমাজের দুর্বলতর অংশ শ্রমিকদের রক্ষা করার জন্যে আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে শুরু করেন। ১৯০৩ সালে জি. সুব্রমনিয়া আয়ার জোর দিয়ে বলেন, নিজেদের অধিকারের জন্যে সংগ্রাম করতে শ্রমিকদের ইউনিয়নে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হতে হবে এবং তার জন্যে জনসাধারণকে সর্বপ্রকারে শ্রমিকদের সাহায্য করতে হবে।[৩]

★

১৯০৩-৮ সালের স্বদেশী আন্দোলন ছিল শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক সুস্পষ্ট দিকচিহ্ন। একই সরকারি সমীক্ষায় বিশেষভাবে বলা হয়েছিল 'পেশাদার আন্দোলনকারীদের' আবির্ভাব এবং শিল্প ধর্মঘটে শ্রমিকদের 'সংগঠন ক্ষমতা' এই সময়ের দুটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য।[৪] ধর্মঘটের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছিল এবং অনেক স্বদেশী নেতা সোৎসাহে স্থায়ী ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার, ধর্মঘটে আইনি সাহায্য ও অর্থ সংগ্রহের কাজে নেমেছিলেন। ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমর্থনে জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ ও লিয়াকৎ হোসেনের মত জাতীয় নেতারা। যেসব স্বদেশী নেতা শ্রমিক সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাদের মধ্যে চারজনের নাম বিশেষভাব উল্লেখ করা যেতে পারে—অশ্বিনীকুমার ব্যানার্জী, প্রভাতকুমার রায়চৌধুরী, প্রেমতোষ বসু ও অপূর্বকুমার ঘোষ। অনেক ধর্মঘটে তাঁরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করলেও, শ্রমিকদের সংগঠন গড়ে তোলা ও জনসমর্থনলাভ উভয় দিক থেকেই তাঁরা সবচেয়ে বেশি সফল হয়েছেন সরকারি ছাপাখানা, রেলপথ ও চটকলের শ্রমিকদের মধ্যে। লক্ষণীয়, এসব ক্ষেত্রেই হয় বিদেশী পুঁজির আর না-হয় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের একাধিপত্য ছিল।

Scanned with CamScanner

কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় প্রায়ই ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল বার করা হয়েছে। লোকে খাবার দিয়েছে মিছিলকারীদের। দিয়েছে চাঁদা, চাল, আলু ও শব্জি। দাতাদের মধ্যে নারীরা, এমনকি পুলিশ কনস্টেবলরা পর্যন্ত ছিলেন। সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার উদ্যোগও এই সময় নেওয়া হয়েছিল। তবে তা সফল হয়নি। ইউরোপীয় ও ভারতীয় সংস্থাগুলোতে নিযুক্ত শ্রমিকদের সম্পর্কে আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য এই সময়ে বরাবরই বজায় থেকেছে।

স্বদেশী আমলে শ্রমিক আন্দোলন শুধুই অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে প্রচার ও সংগ্রামে থেকে তখনকার ব্যাপকতর রাজনৈতিক বিষয়গুলোতে শ্রমিকদের অংশগ্রহণের পর্যায়ে যায়। এটাই সম্ভবত এই সময়ে শ্রমিক আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই আন্দোলন অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে অসংগঠিত ও স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট থেকে উত্তীর্ণ হল অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে জাতীয়তাবাদীদের সমর্থনপুষ্ট সংগঠিত ধর্মঘটের এবং তারপরে ব্যাপকতর রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোতে শ্রমিক শ্রেণীর অংশগ্রহণের স্তরে।

১৯০৫-এর ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করার দিনে সারা দেশ জুড়ে আন্দোলনের ঢেউ উঠেছিল। বাংলায় শ্রমিক শ্রেণী আচমকা ধর্মঘট ও হরতাল করে। অনেক চটকলের ও ফিতাকলের শ্রমিক, রেলের কুলি ও গাড়োয়ানরা সবাই কাজ বন্ধ করে দেন। স্বদেশী নেতারা ফেডারেশন হলে সভা ডেকেছিলেন। কর্তৃপক্ষ সেই সভায় যোগ দেওয়ার অনুমতি না দেওয়ায় হাওড়ায় বার্ন কোম্পানির জাহাজ তৈরি ও মেরামতের কারখানার ১২,০০০ শ্রমিক কাজ বন্ধ করে দেন। তারা বন্দে মাতরম গান গাওয়া ছাড়াও ঐক্যের প্রতীক হিসেবে একে অপরের হাতে বেঁধে দেন রাখি। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ আপত্তি করলে শ্রমিকরা ধর্মঘটও করেন।

তামিলনাড়ুর তুতিকোরিনে সুব্রমনিয়া শিব ১৯০৮-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চে বিদেশী মালিকানাধীন একটা বস্ত্র কারখানায় ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচার করতে গিয়ে বলেছিলেন, বেশি মজুরির জন্যে ধর্মঘট বিদেশী কলকারখানাগুলোকে লাটে তুলে দেবে। শিব ও বিখ্যাত নেতা চিদাম্বরম পিল্লাইকে গ্রেপ্তার করা হলে, তুতিকোরিন ও তিরুনেলভেলিতে ব্যাপক ধর্মঘট ও সঙ্ঘর্ষ হয়েছিল।

১৯০৭-এ পাঞ্জাবে আন্দোলনের অংশ হিসেবে রাওয়ালপিণ্ডিতে অস্ত্র ও রেলওয়ে ইনজিনিয়ারিং কারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন। পরিণামে লাজপত রায় ও অজিত সিংকে বহিষ্কার করা হয় পাঞ্জাব থেকে। এই সময়ে শ্রমিক শ্রেণীর সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক বিক্ষোভ সম্ভবত হয়েছিল তিলকের বিচার ও তারপরে শাস্তির সময়। এ নিয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

আমূল সংস্কারকামী জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে অনেকেরই ইউরোপে সমসাময়িক মার্কসবাদী ও সোস্যাল ডেমোক্রেটিক শক্তিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল। স্বদেশী আমলে তাদের অনেকের মধ্যেই সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সূত্রপাতের একটা ক্ষীণ আভাসও লক্ষ্য করা গেল। কার্যকর রাজনৈতিক প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের দৃষ্টান্ত ভারতেও অনুসরণ করার আহ্বান জানান শুরু হল।

১৯০৮-এর পরে জাতীয়তাবাদী গণ-আন্দোলনের স্রোতে ভাটার টান দেখা যায়। ফলে শ্রমিক আন্দোলনও ঔজ্জ্বল্য হারাতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরের বছরগুলোতে আবার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জোয়ার এল। তার ফলে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনও ফিরে পেল তার প্রাণশক্তি, তবে এবার গুণগতভাবে উচ্চতর স্তরে।

Scanned with CamScanner

★

১৯১৫-তে দুটি 'হোম রুল লীগ' গঠন থেকে শুরু হয়ে ১৯১৯-এর রাওলাট সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়ে জাতীয় আন্দোলন আবার তুঙ্গে উঠল ১৯২০-২২ সালের অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের মধ্যে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯১৯ থেকে ১৯২২-এর মধ্যে শ্রমিক শ্রেণী আবার সক্রিয় হয়ে উঠল। শ্রমিক শ্রেণী এখন নিজস্ব জাতীয় স্তরের সংগঠন গড়ে তুলল নিজের শ্রেণীর অধিকার রক্ষার জন্যে। এই সময়েই শ্রমিক শ্রেণী জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মূল স্রোতধারায়ও তাৎপর্যপূর্ণভাবে যুক্ত হল।

১৯২০-তে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (এ আই টি ইউ সি) গঠন ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তিলক বোম্বাইর শ্রমিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুলেছিলেন। তিনিই ছিলেন এ আই টি ইউ সি গঠনের অন্যতম প্রাণপুরুষ। এই সংগঠনের প্রথম সভাপতি হন পাঞ্জাবের বিখ্যাত চরমপন্থী নেতা লালা লাজপত রায় এবং সাধারণ সম্পাদক হন দেওয়ান চমনলাল। তিনি ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনে একজন অতিবিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। এ আই টি ইউ সি-র প্রথম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে লালা লাজপত রায় জোর দিয়ে বলেন, '...জাতীয় স্তরে নিজেদের সংগঠিত করার ব্যাপারে ভারতীয় শ্রমিকদের এতটুকু দেরি করা উচিত নয়। ... তাদের সংগঠিত, ও শিক্ষিত করে তোলাই এদেশে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। ...আমাদের শ্রমিকদের সংগঠিত, শ্রেণী-সচেতন করে তুলতেই হবে।' তিনি জানতেন শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে আগ্রহী বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে সাহায্য, পরামর্শ ও সহযোগিতা শ্রমিকদের 'আগামী কিছুদিনের জন্যে' প্রয়োজন হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন, 'শেষ পর্যন্ত শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে থেকেই নিজেদের নেতা খুঁজে পাবেন।'[৫]

এ আই টি ইউ সি শ্রমিকদের জন্যে যে ইস্তাহার প্রকাশ করে তাতে শ্রমিকদের শুধু সংগঠিত হতেই নয়, জাতীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতেও আহ্বান জানান হয় : 'ভারতীয় শ্রমিকগণ! ...আপনাদের দেশের নেতারা স্বরাজ দাবি করছেন, আপনারা নিজেদের নগণ্য ভাববেন না। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোন মূল্য নেই। সুতরাং, জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে নিজেদের আন্দোলনকে উপেক্ষা করতে আপনারা পারেন না। আপনারা স্বাধীনতা সংগ্রামের অপরিহার্য অংশ। একে উপেক্ষা করলে আপনারা নিজেদের মুক্তি বিপন্ন করবেন।'[৬]

ভারতে যারা প্রথম পুঁজিবাদকে যুক্ত করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এবং এই জোটের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর জোর দিয়েছিলেন লাজপত রায় তাদের অন্যতম। ১৯২০-এর ৭ নভেম্বর তিনি বলেছিলেন : 'সংগঠিত পুঁজিবাদী শক্তিগুলো ভারতের রক্তমোক্ষণ করে তাকে রক্তশূন্য করে দিয়েছে। ভারত আজ এর পদতলে শয়ান। সমরবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের দুই যমজ সন্তান ; তারা তিনের মধ্যে এক, একের মধ্যে তিন। তাদের ছায়া, তাদের ফল, তাদের ছালবাকল সব বিষাক্ত। হালে তার একটা ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে। সে ওষুধ সংগঠিত শ্রমিক।'[৭]

ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিযুক্ত শ্রমিকদের সম্পর্কে জাতীয়তাবাদীদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটছিল। তাকে প্রতিফলিত করে লাজপত রায় বলেছিলেন: 'আমাদের প্রায়ই বলা হয় মাঞ্চেস্টার ও জাপানের সঙ্গে সফল প্রতিযোগিতা করতে হলে ভারতীয় পুঁজিকে উচ্চহারে মুনাফা করার সুযোগ দিতে হবে, আর এজন্যে শস্তা শ্রমিক একান্ত প্রয়োজন। আমরা এ যুক্তি মানতে রাজি নই।...দেশপ্রেমের আবেদন ধনী ও গরিব সবাইকে নাড়া দেয়। বাস্তবিকপক্ষে, গরিবের চেয়ে ধনীকে নাড়া দেয় বেশি।...ভারতীয় শ্রমশিল্পের বিকাশ শুধু শ্রমিকদের বিনিময়ে

Scanned with CamScanner

ঘটতে পারে না। ভারতীয় পুঁজিপতিদের শ্রমিকদের সঙ্গে মাঝামাঝি আপস করতে হবে, যুক্তিসম্মত ও ন্যায্য অনুপাতে মুনাফা ভাগাভাগি করার ভিত্তিতে আপসে আসতে হবে।...ভারতীয় পুঁজি যদি শ্রমিকদের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করতে চায় এবং শুধুই বিপুল মুনাফার কথা ভাবে তাহলে সে যেন শ্রমিকদের কাছ থেকে কোন সাড়া ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কোন সহানুভূতির প্রত্যাশা না করে।'[৮]

অনুরূপভাবে, এ আই টি ইউ সি-র দ্বিতীয় অধিবেশনে দেওয়ান চমনলাল স্বরাজের পক্ষে, প্রস্তাব তুলতে গিয়ে বলেন, স্বরাজ আসবে। তবে পুঁজিপতিদের জন্যে নয়, শ্রমিকদের জন্যে।

লাজপত রায় ছাড়াও, সেই সময়ের অনেক জাতীয়তাবাদী নেতা এ আই টি ইউ সি-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। এর তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সি. আর. দাশ। অন্যান্য বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে ছিলেন সি. এফ. অ্যান্ড্রুজ, জে. এম. সেনগুপ্ত, সুভাষ বসু, জওহরলাল নেহরু ও সত্যমূর্তি। ১৯২২-এ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গয়া অধিবেশন এ আই টি ইউ সি গঠনকে স্বাগত জানায়। এর কাজকর্মে সাহায্য করার জন্যে বিশিষ্ট কংগ্রেসীদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করে।

কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সি. আর. দাশ বলেন, কংগ্রেসকে 'শ্রমিক ও কৃষকদের নিজের পক্ষে আনতেই হবে...এবং তাদের বিশেষ স্বার্থের দৃষ্টিকোণ ও উচ্চতর আদর্শের দৃষ্টিকোণ উভয় দিক থেকে সংগঠিত করতে হবে। এই আদর্শের জন্যেই তাদের বিশেষ স্বার্থ রক্ষা করা এবং এই স্বার্থকে স্বরাজের কাজে লাগান দরকার।' তিনি সতর্ক করে দেন, এটা না করা হলে 'স্বরাজের আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন' শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠন গড়ে উঠবে এবং তা 'শ্রেণী সংগ্রাম ও বিশেষ স্বার্থের লড়াই চালাবে।'[৯]

পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শ্রমিক শ্রেণী চমৎকারভাবে সাড়া দিয়েছিল। ১৯২০-এ ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল ১২৫ আর সদস্য সংখ্যা ২,৫০,০০০। এগুলোর বেশিরভাগই তৈরি হয়েছিল ১৯১৯-২০ সালে। বড় বড় জাতীয় রাজনৈতিক ঘটনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণও ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯১৯-এর এপ্রিলে পাঞ্জাবে দমন-পীড়ন ও গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের পর আমেদাবাদের ও গুজরাটের অন্যান্য অংশের শ্রমিক শ্রেণী ধর্মঘট আন্দোলন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করে। আমেদাবাদে সরকারি ভবনে আগুন লাগান হয়। লাইনচ্যুত করা হয় ট্রেন। ছিঁড়ে ফেলা হয় টেলিগ্রাফের তার। সরকারি দমন-পীড়নের ফলে ২৮ জন নিহত ও ১২৩ জন আহত হন। শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিবাদের ঢেউ আলোড়িত করে কলকাতা ও বোম্বাইকে।

অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে রেল শ্রমিকদের আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ উপনিবেশবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলনও হয়েছিল। ১৯১৯ থেকে ১৯২১-এর মধ্যে অনেকবারই রেল শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছেন রাওলাট আইন-বিরোধী বিক্ষোভের এবং অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের সমর্থনে। ১৯১৯-এর এপ্রিলে উত্তর-পশ্চিম রেলপথের শ্রমিকরা ভারতব্যাপী ধর্মঘট ডাকলে উত্তরাঞ্চলে সোৎসাহ সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। লাজপত জগ্গা দেখালেন দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের রেল কর্মীদের কাছে গান্ধীজী ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীক, যেমন, ভারতীয় রেলপথ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের, 'ব্রিটিশ রাজের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক আকাঙ্খার' প্রতীক।[১০]

১৯২১-এর নভেম্বরে, প্রিন্স অব ওয়েলস-এর সফরের সময় কংগ্রেসের বয়কটের আহ্বানে শ্রমিকরা সাড়া দিয়েছিলেন দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট করে। বোম্বাইতে বস্ত্রকলগুলো বন্ধ ছিল

Scanned with CamScanner

এবং প্রায় ১,৪০,০০০ শ্রমিক রাস্তায় নেমে দাঙ্গায় অংশ নিয়েছিলেন, ইউরোপীয়দের ও প্রিন্স অব ওয়েলসকে স্বাগত জানাতে গিয়েছিলেন বলে পার্সীদের উপর আক্রমণ চালিয়েছিলেন। এসব ঘটনাবহুল বছরে যে মানসিকতা ও আকাঙ্খা শ্রমিকদের চালিত করেছে তা, জাতীয়তাবাদী জাগরণ ও শ্রমিকদের নিজস্ব আশা-আকাঙ্খার মধ্যে সম্পর্ক সবচেয়ে ভালভাবে প্রকাশ পেয়েছে বোম্বাইর বস্ত্রকলের নিরক্ষর শ্রমিক এবং পরবর্তিকালে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের অন্যতম নেতা অর্জুন আত্মারাম অলওয়ের কথায় : 'আমাদের সংগ্রাম যখন ...এভাবে চলছিল, তখন দেশে বাজতে শুরু করেছিল রাজনৈতিক আন্দোলনের দামামা। ভারতের নিজস্ব প্রশাসন চালানোর অধিকার দাবি করে বিরাট আন্দোলন শুরু করেছিল কংগ্রেস। সেই সময়ে আমরা শ্রমিকরা স্বরাজের দাবির অর্থ বুঝেছিলাম শুধু এভাবে : আমাদের ঋণের বোঝা দূর হবে। বন্ধ হবে মহাজনের অত্যাচার। আমাদের মাইনে বাড়বে। মালিকরা শ্রমিকদের উপর যে নির্যাতন চালায়, আমাদের উপর যে লাথি-ঘুষি চালায় আইন করে তা বন্ধ করা হবে। তার ফলে আমাদের শ্রমিকদের উপর আর জুলুম করা হবে না। এরকম সব চিন্তা আমাদের শ্রমিকদের মনে এসেছিল। আমাদের মধ্যেকার অনেক শ্রমিক, আর আমি নিজে অসহযোগ আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নাম লিখিয়েছিলাম।'[১১]

১৯১৮-তে গান্ধীজী প্রতিষ্ঠিত আমেদাবাদ টেক্সটাইল লেবার অ্যাসোসিয়েশনের (টি এল এ) কথা উল্লেখ না করলে এই বছরগুলো সম্পর্কে যেকোন আলোচনাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ১৪,০০০ শ্রমিক এই ইউনিয়নের সদস্য হয়েছিলেন এবং এটাই সম্ভবত সেই সময়ের সবচেয়ে বড় ট্রেড ইউনিয়ন। পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের স্বার্থের অছি এই নীতির ভিত্তিতে গান্ধীজীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সালিসিকে হামেশাই খুব ভাবনাচিন্তা না করে শ্রেণী সহযোগিতার নীতি ও শ্রমিকদের স্বার্থ-বিরোধী বলে খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। ১৯১৮-র বিরোধের সময় টি এল এ সবচেয়ে বেশি পরিমাণে (২৭.৫ শতাংশ) মজুরি বাড়াতে পেয়েছিল। এটা ছাড়াও অছি সংক্রান্ত গান্ধীজীর ধারণায় যে আমূল সংস্কারের সম্ভাবনা-শক্তিও ছিল সাধারণভাবে তা বুঝতে চাওয়া হয়নি। গান্ধীজীর একনিষ্ঠ অনুগামীদের অন্যতম আচার্য জে. বি. কৃপালনি বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে : 'অছি শব্দটি যে ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ সে মালিক নয়। মালিক সেই যার স্বার্থ রক্ষা করতে বলা হয়েছে', অর্থাৎ, শ্রমিকরা। গান্ধীজী নিজে আমেদাবাদের বস্ত্র শ্রমিকদের বলেছিলেন 'তারাই কারখানার আসল মালিক, আর অছি মিল মালিক যদি আসল মালিকদের স্বার্থে কাজ না করে তাহলে শ্রমিকরা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে সত্যাগ্রহ করবে।'[১২] শ্রমিক সম্পর্কে গান্ধীজীর দর্শনে সালিসি ও অছি ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই দর্শন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের চাহিদাও প্রতিফলিত করেছে। এই আন্দোলন উদীয়মান জাতির অপরিহার্য শ্রেণীগুলোর মধ্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে শ্রেণীযুদ্ধ চালাতে দিতে পারত না।

১৯২২-এর পর শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে ভাটা দেখা দিল, এবং তা সীমাবদ্ধ রইল শুধুই অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে সংগ্রামের, অর্থাৎ কর্পোরেটিজমের মধ্যে। শ্রমিক শ্রেণী আবার খুব সক্রিয় হয়ে উঠল ১৯২০-এর দশকের শেষদিকে। এবার এতে প্রেরণা যুগিয়েছিল জাতীয় আন্দোলনে একটি শক্তিশালী ও সুস্পষ্টভাবে গড়ে ওঠা বামপন্থী জোট।

★

১৯২০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে বিভিন্ন বামপন্থী মতাদর্শগত ধারা সংহত হয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলতে শুরু করে জাতীয় আন্দোলনের উপরে। ১৯২৭-এর গোড়ার দিকে ভারতের

Scanned with CamScanner

বিভিন্ন অংশে অনেকগুলো কমিউনিস্ট গোষ্ঠী মিলে এস. এ. ডাঙ্গে, মুজাফ্ফর আমেদ, পি. সি. যোশী ও সোহন সিং যোশের নেতৃত্বে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি (ডব্লিউ পি পি) গঠন করে। ডব্লিউ পি পি কর্মীরা কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী ধারা হিসেবে কাজ করতে থাকেন, দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করতে থাকেন প্রাদেশিক ও সর্বভারতীয় স্তরে কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে।

ডব্লিউ পি পি-র অধীনে ব্যাপক বামপন্থী মোর্চার মধ্যে কাজ করে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে কমিউনিস্টদের প্রভাব ১৯২৭-এর গোড়ার দিকে খুব সামান্য থেকে বেড়ে ১৯২৮-এর শেষদিকে বাস্তবিকই খুব শক্তিশালী হয়। বোম্বাইতে, বস্ত্রকল শ্রমিকদের ছমাসব্যাপী ঐতিহাসিক সাধারণ ধর্মঘটের পর (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ১৯২৮) কমিউনিস্টদের নেতৃত্বাধীন গিরনী কামগড় ইউনিয়ন (জি কেইউ) শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। এর সদস্যসংখ্যা ৩২৪ থেকে বেড়ে ১৯২৮-এর শেষে ৫৪,০০০ হয়। কমিউনিস্টদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে বাংলা ও বোম্বাইর রেলপথ, চটকল, পৌরসভা, কাগজকল প্রভৃতির এবং মাদ্রাজে বার্মা অয়েল কোম্পানির শ্রমিকদের মধ্যে। ১৯২৮-এর ঝরিয়া অধিবেশনেও এ আই টি ইউ সি-র মধ্যে কমিউনিস্ট সমেত সামগ্রিকভাবে বামপন্থীরা বিশেষ স্থান অধিকার করেন। ফলে এন. এম. যোশীর নেতৃত্বে কর্পোরেটিজমের সমর্থকরা পরবর্তী অধিবেশনে এ আই টি ইউ সি ভেঙ্গে বেরিয়ে যান এবং সভাপতি হন জওহরলাল নেহরু। ১৯২৮-এর শেষদিকে সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে জানান, 'কমিউনিজমের যে ঢেউ সারা দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার প্রভাবে সামগ্রিক বা আংশিক ভাবে প্রভাবিত হয়নি এমন কোন জন-পরিসেবা ব্যবস্থা বা শিল্প নেই।'[১৩]

কমিউনিস্ট ও র‍্যাডিকাল জাতীয়তাদীদের প্রভাবে শ্রমিকরা ১৯২৭ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে সারা দেশে অনেকগুলো ধর্মঘট ও বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯২৭-এর নভেম্বের এ আই টি ইউ সি সাইমন কমিশন বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয় এবং শ্রমিকরা সাইমন বয়কট সমাবেশগুলোতে ব্যাপকভাবে যোগ দেন। মে দিবস, লেনিন দিবস, রুশ বিপ্লব বার্ষিকী প্রভৃতি উপলক্ষে সংগঠিত করা হয়েছিল অসংখ্য শ্রমিক সভা।

সরকার শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংগ্রামী মনোভাবে ও রাজনীতিতে তাদের অংশগ্রহণে, বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী ধারাগুলো ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় বিচলিত হয়ে শ্রমিক আন্দোলনের উপর সাঁড়াশি আক্রমণ চালালেন। একদিকে, 'জন-নিরাপত্তা আইন' ও 'শিল্প-বিরোধ আইন'-এর মত দমনমূলক আইন পাশ করে আচমকা শ্রমিক আন্দোলনের কার্যত গোটা র‍্যাডিকাল নেতৃত্বকে গ্রেপ্তার করলেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে বিখ্যাত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করলেন। অপরদিকে, সরকার কিছুটা সফলভাবেই সুযোগ-সুবিধা দিয়ে (যেমন ১৯২৯-এ 'রয়াল লেবার কমিশন' নিয়োগ) শ্রমিক আন্দোলনের একটা বড় অংশকে নিয়মতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী ও কর্পোরেটপন্থী করে তুললেন।

অংশত এই সরকারি আক্রমণের দরুন এবং অংশত এই আন্দোলনের কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন অংশের মনোভাবের পরিবর্তনের দরুন শ্রমিক আন্দোলন একটা বড় ধাক্কা খায়। পরবর্তিকালে এই বিষয়টি নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব; এখন শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, কমিউনিস্টরা তখন জাতীয় আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং শ্রমিক শ্রেণীর উপরে পর্যন্ত তাদের প্রভাব অনেক কমে যায়। জি কে ইউ-র সদস্যসংখ্যা পর্যন্ত ১৯২৮-এর ৫৪,০০০ থেকে কমে ১৯২৯-এর শেষে ৮০০-তে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে, এ আই টি ইউ সি-র মধ্যে কমিউনিস্টরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং ১৯৩১-এর ভাঙ্গনের মধ্যে দিয়ে তাদের এই সংগঠন থেকে বের করে দেওয়া হয়।

Scanned with CamScanner

আইন অমান্য আন্দোলন থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করার প্রভাব বোম্বাইর শ্রমিক আন্দোলনের উপর কতটা পড়েছিল তার সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় ১৯৩০-এ প্রকাশিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (সি পি আই) একটা দলিল থেকে : '...আমরা কার্যত এই আন্দোলন (আইন অমান্য) থেকে সরে এসে গোটা ময়দান ছেড়ে দিয়েছিলাম কংগ্রেসকে, আমরা আমাদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ করেছিলাম ছোট্ট একটা গোষ্ঠীর মধ্যে। ফলে...শ্রমিকদের মনে এমন একটা ধারণা জন্মেছিল যে আমরা কিছুই করছি না আর কংগ্রেসই একমাত্র সংগঠন যা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছে। সুতরাং, শ্রমিকরা কংগ্রেসের নেতৃত্ব অনুসরণ করতে শুরু করলেন।'[১৪]

তা সত্ত্বেও শ্রমিকরা সারা দেশ জুড়ে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। এই আন্দোলন চলাকালে শোলাপুরের বস্ত্র শ্রমিকরা, করাচীর বন্দর শ্রমিকরা, কলকাতার পরিবহণ ও কারখানা শ্রমিকরা এবং মাদ্রাজের কারখানা শ্রমিকরা সরকারের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ করেছেন বীরের মত। একটা ব্রিটিশ-বিরোধী মিছিল আটকানর জন্যে পুলিশ গুলি চালানোর পর ৭ থেকে ১৬ মে শোলাপুরের বস্ত্র শ্রমিকদের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা দেখা দেয়। সরকারি দপ্তর, আদালত, থানা ও রেল স্টেশনের উপর আক্রমণ চালানো হয় এবং বিদ্রোহীরা কয়েক দিনের জন্যে নগর প্রশাসন কার্যত নিজেদের হাতে তুলে নেন। শহরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিদ্রোহ দমনের জন্যে সরকারকে সামরিক আইন জারি করতে হয়েছিল। বেশ কিছু শ্রমিককে দেওয়া হয়েছিল ফাঁসি বা দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড।

বোম্বাইতে অসহযোগ আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের স্লোগান ছিল, 'শ্রমিক ও কৃষকরা কংগ্রেসর হাত ও পা।'[১৫] ১৯৩০-এর ৪ ফেব্রুয়ারি ২০,০০০ শ্রমিক ধর্মঘট করেন বোম্বাইতে। এদের বেশিরভাগই ছিলেন জি আই পি রেল শ্রমিক। ৬ এপ্রিল গান্ধীজী লবণ সত্যাগ্রহ করেছিলেন। সেদিনই জি আই পি রেলওয়েমেনস ইউনিয়নের শ্রমিকরা একটা অভিনব কায়দায় সত্যাগ্রহ শুরু করেন। দলে দলে শ্রমিক উত্তর বোম্বাইর শহরতলীর রেল স্টেশনগুলোতে গিয়ে লাইনের উপরে লাল পতাকা লাগিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েন। লাইন পরিষ্কার করার জন্যে গুলি চালাতে হয় পুলিশকে। ব্যাপক গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ৬ জুলাই গান্ধী দিবস ঘোষণা করে। ওই দিন প্রায় ৫০,০০০ শ্রমিক হরতালে যোগ দেন। 'টুল ডাউন' অর্থাৎ কর্মস্থলে উপস্থিত থেকেও কাজ বন্ধ করেন ৪৯টি কারখানার শ্রমিকরা।

★

১৯৩১ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে। শ্রমিক আন্দোলনে ভাটার টান দেখা যায়। ১৯৩২-৩৪ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনেও শ্রমিকরা সক্রিয়ভাবে যোগ দেননি। শ্রমিক শ্রেণী আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে ১৯৩৭-৩৯ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও জনপ্রিয় সরকার গঠনের সময়।

ইতিমধ্যে কমিউনিস্টরা তাদের আত্মঘাতী সঙ্কীর্ণ রাজনীতি পরিত্যাগ করে ১৯৩৪-এ আবার জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মূল স্রোতধারায় প্রবেশ করেন। ১৯৩৫-এ তারা আবার এ আই টি ইউ সি-তে যোগ দেন। জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে ও ট্রেড ইউনিয়নে আবার বাড়তে থাকে বামপন্থী প্রভাব। কমিউনিস্ট, কংগ্রেস সোসালিস্ট এবং জওহরলাল নেহরু ও সুভাষ বসুর নেতৃত্বে বামপন্থী জাতীয়তাবাদীরা এবার কংগ্রেসের ও অন্যান্য গণ-সংগঠনের মধ্যে শক্তিশালী বামপন্থী সংহতি গড়ে তুললেন।

১৯৩৭-এ নির্বাচনী প্রচার শুরু হলে এ আই টি ইউ সি অল্প কয়েকটি কেন্দ্র বাদে সর্বত্র কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থন করে। কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে ঘোষণা করা হয় কংগ্রেস শ্রম-বিরোধের মীমাংসার জন্যে এবং ইউনিয়ন গঠন ও ধর্মঘট করার অধিকার অর্জনের জন্যে

Scanned with CamScanner

কার্যকর পদক্ষেপ নেবে। কংগ্রেসী প্রাদেশিক সরকারগুলোর আমলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯-এর মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ২৭১ থেকে বেড়ে ৫৬২ এবং ওইসব ইউনিয়নের মোট সদস্যসংখ্যা ২,৬১,০৪৭ থেকে বেড়ে ৩,৯৯,১৫৯ হয়। ধর্মঘটের সংখ্যাও বেড়েছিল উল্লেখযোগ্যভাবে।

কংগ্রেসী সরকারগুলোর আমলে নাগরিক অধিকার বেড়েছিল এবং কংগ্রেস মন্ত্রিসভা শ্রমিক দরদী মনোভাব নিয়েছিল। সেই সময়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যে উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছিল এটা তার অন্যতম প্রধান কারণ। এই সময়ে ধর্মঘটের আর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য বেশিরভাগ ধর্মঘটেরই সফল পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। শ্রমিকরা অর্জন করেছিলেন পূর্ণ বা আংশিক সাফল্য।[১৬]

১৯৩৯-এর ৩ সেপ্টেম্বর শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। পৃথিবীতে যারা প্রথম যুদ্ধ- বিরোধী ধর্মঘট করেছিল বোম্বাইর শ্রমিক শ্রেণী তাদের অন্যতম। ১৯৩৯-র ২ অক্টোবর বোম্বাইর প্রায় ৯০,০০০ শ্রমিক এই ধর্মঘটে অংশ নেন। যুদ্ধ প্রয়াস বিপর্যস্ত হতে পারে এমন যেকোন উদ্যোগ ঠেকাতে খুবই উৎসুক ছিলেন সরকার। তবে প্রচণ্ড সরকারি দমন-পীড়ন সত্ত্বেও অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে সারা দেশে অনেকগুলো ধর্মঘট হয়।

কিন্তু, ১৯৪১-এ নাৎসীরা সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার পর কমিউনিস্টরা যুক্তি দেখালেন যুদ্ধের চরিত্র বদলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে জনযুদ্ধে পরিণত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি বিপন্নকারী ফ্যাসিবাদকে পরাজিত করার জন্যে মিত্র শক্তিকে সমর্থন করাই এখন শ্রমিক শ্রেণীর কাজ। নীতির এই পরিবর্তনের জন্যেই ১৯৪২-এর আগস্টে গান্ধীজী যে ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু করেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টি তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়। উৎপাদন ও যুদ্ধ প্রয়াস যাতে ব্যাহত না হয় তার জন্যে মালিকদের সঙ্গে শিল্প শান্তি নীতিও কমিউনিস্টরা সাফল্যের সঙ্গে অনুসরণ করতে থাকেন।

কমিউনিস্টদের উদাসীনতা কিংবা বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারত ছাড় আন্দোলন থেকে শ্রমিক শ্রেণী দূরে থাকেনি। ১৯৪২-এর ৯ আগস্ট ভারত ছাড় প্রস্তাব নেওয়ার ঠিক পরেই গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতাকে গ্রেপ্তার করা হলে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বোম্বাই, নাগপুর, আমেদাবাদ, জামশেদপুর, মাদ্রাজ, ইন্দোর ও বাঙ্গালোরের শ্রমিকরা এক সপ্তাহ ধরে ধর্মঘট ও হরতাল করেন। টাটা ইস্পাত কারখানা তের দিন ধরে বন্ধ ছিল এবং ধর্মঘটী শ্রমিকরা দাবি তুলেছিলেন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত তারা কাজে যোগ দেবেন না। আমেদাবাদ বস্ত্রকলে ধর্মঘট চলেছিল সাড়ে তিন মাস ধরে, মিল মালিকরা জাতীয় স্বার্থে কার্যত তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন! কমিউনিস্টদের প্রভাবিত এলাকায় অবশ্য শ্রমিকদের অংশগ্রহণ কম ছিল। যদিও অনেক এলাকায় সাধারণ কমিউনিস্ট কর্মীরা পার্টি লাইন আলাদা হওয়া সত্ত্বেও ভারত ছাড় আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন।

★

১৯৪৫-৪৭ সালে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে নতুন জোয়ার শুরু হল। যুদ্ধে জোরদার রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ নিলেন অগণিত শ্রমিক। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের বিচারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শহরে নগরে, বিশেষ করে কলকাতায় সংগঠিত অসংখ্য সভা ও মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন তারা। ১৯৪৫-এর শেষদিকে বোম্বাই ও কলকাতায় বন্দর শ্রমিকরা ইন্দোনেশিয়াগামী জাহাজগুলোতে মাল বোঝাই করতে অস্বীকার করলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলন দমন করার কাজে নিযুক্ত সৈন্যদের রসদ সরবরাহ করা হচ্ছিল এসব জাহাজে করে।

Scanned with CamScanner

১৯৪৬-এ নৌসেনাদের বিদ্রোহের সমর্থনে বোম্বাইর শ্রমিকদের ধর্মঘট ও হরতাল সম্ভবত এই সময়ে শ্রমিকদের সবচেয়ে নজর-কাড়ার মত আন্দোলন। কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে সাড়া দিয়ে ২২ ফেব্রুয়ারি দুই থেকে তিন লক্ষ শ্রমিক 'টুল ডাউন' করেন। সমাজতন্ত্রীরাও এই আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন। পুলিশ হস্তক্ষেপ করলে শান্তিপূর্ণ সভা ও সমাবেশে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সহিংস সংঘর্ষ বাধে। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে যেসব রাস্তায় সামনাসামনি লড়াই হয়েছিল সেগুলোতে ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়। শহরে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য মোতায়েন করতে হয়েছিল; প্রাণ দিয়েছিলেন প্রায় ২৫০ জন আন্দোলনকারী।

ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ বছরগুলোতে অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে ধর্মঘট সারা দেশে লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছিল। ডাক ও তার বিভাগের কর্মীদের সর্বভারতীয় ধর্মঘট এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত। যুদ্ধের সময়ে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক দুর্দশা দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধের পরে সেনাদল ভেঙ্গে দেওয়ার ফলে উদ্ভব হল নানা সমস্যার। আর সেই সঙ্গে জিনিসপত্রের দর বেড়েই চলল। দেখা দিল খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব। কমল প্রকৃত মজুরি। সব মিলিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল।

স্বাধীনতা আসছে এই আশায় পরিপূর্ণ হয়েছিল মানুষের মন। ভারতীয় জনগণের সকল অংশই স্বাধীনতাকে দেখছিলেন তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর হওয়ার বার্তা হসেবে। শ্রমিকরাও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তারাও স্বাধীনতালাভের পর নিজেদের অধিকার হিসেবেই যেসব অধিকার পাবেন বলে আশা করছিলেন এবার সেগুলোর জন্যে সংগ্রাম শুরু করলেন।

টীকা

১। 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস', সমস্ত সভাপতির ভাষণের পূর্ণপাঠ প্রভৃতি সম্বলিত, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১২।

২। বিপান চন্দ্র, 'রাইজ অ্যান্ড গ্রোথ অব ইকনমিক ন্যাশনালিজম ইন ইন্ডিয়া' উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৬০-৬১ তে উদ্ধৃত।

৩। জি. সুব্রমনিয়া আয়ার, 'সাম ইকনমিক অ্যাসপেক্টস অব ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া', মাদ্রাজ, ১৯০৩, পৃঃ ১৭৫-৮, ২১৮-৩২।

৪। সুমিত সরকার, 'দা স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, ১৯০৩-১৯০৮', পৃ ঃ ১৮৩-৪।

৫। 'এ আই টি ইউ সি-- ফিফটি ইয়ারস, ডকুমেন্টস', নয়া দিল্লী, ১৯৭৩, পৃ ঃ ৩০, ৩৫।

৬। ঐ, পৃ ঃ ৭৮-৯।

৭। 'লালা লাজপত রায় : রাইটিংস অ্যান্ড স্পিচেস', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ঃ ৫৭।

৮। ঐ, পৃঃ ৬০-৬১

৯। বালাবুশেভিচ ও দিয়াকভ সম্পাদিত, 'এ কনটেম্পোরারি হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া', নয়া দিল্লী, ১৯৬৪, পৃঃ ১৫০-এ উদ্ধৃত।

১০। লাজপত জন্মার 'কলোনিয়াল রেলওয়েমেন অ্যান্ড ব্রিটিশ রুল : এ প্রোব ইনটু রেলওয়ে লেবার এজিটেশন ইন ইন্ডিয়া, ১৯১৯-১৯২২' প্রবন্ধ দেখুন বিপান চন্দ্র সম্পাদিত 'দা ইন্ডিয়ান লেফট : ক্রিটিকাল অ্যাপরাইজালস' গ্রন্থে, নয়া দিল্লী, ১৯৮৩, পৃঃ ১০৪-৬।

Scanned with CamScanner